Vol. 37 | No. 3 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গীতিকায় চিত্রিত রোমান্স ও রোমান্টিকতা

Volume	37
Issue	3
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ শহীদুর রহমান
Published online	June 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i3.7
Pages	127-143
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ২

Check for updates

গীতিকায় চিত্রিত *রোমান্স* ও রোমান্টিকতা

মোহাম্মদ শহীদুর রহমান[*]

মৈমনসিংহ গীতিকা ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*সমূহের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয় নর-নারীর প্রেমসম্ভূত মানবিক সম্পর্ক। গীতিকার নায়িকা চরিত্রসমূহকে ঘিরে তাই সৃষ্টি হয়েছে *রোমান্স* ও রোমান্টি তার আবর্ত।

গীতিকাসমূহে *রোমান্স* ও রোমান্টিকতার ছায়া দেখা যায় নায়িকার রূপ-বর্ণনায়, নায়িকামনের ভাবকল্পনায়, বিশ্বাস ও সংস্কারে, বিপদ মুক্তির প্রচেষ্টায়, প্রভৃতিতে। তবে এ-সব ধর্মাচারণমুক্ত এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রভাবিত।

মৈমনসিংহ গীতিকায় রোমান্সের অবস্থান, *রোমান্স* ও রোমান্টিকতার মিশ্রণ এবং তার ধারাবাহিক বিকাশ লক্ষণীয়।।

---

[*] অধ্যক্ষ, পদ্মা কলেজ

ময়মনসিংহ এবং *পূর্ববঙ্গ-গীতিকা*সমূহে সমকালীন জীবনের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এর প্রধান দিগদর্শন হচ্ছে নরনারীর প্রেম-সম্ভূত মানবিক সম্পর্ক। গীতিকাগুলির ক্ষেত্রে প্রেমের গভীর মিলনাকাঙ্ক্ষা এবং বিরহ-ব্যর্থতাজড়িত হৃদয়ার্তি কাহিনীর গতিপথ এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করেছে। মধ্যযুগের সৃষ্টি বলে এই হৃদয়ার্তি কল্পনার আতিশয্যসূচক রোমান্সের শরণার্থী। তবে যেহেতু আধ্যাত্মিকতার প্রবল পরাকাষ্ঠা থেকে নানাবিধ কারণে গীতিকাগুলো মুক্তির সন্ধানী এবং মানবিক সম্পর্কে অনেক পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ, সেহেতু এই রোমান্স ধীরে ধীরে রোমান্টিকতার দিকে গড়িয়ে পড়েছে। রোমান্স অতিলৌকিক, অতিপ্রাকৃত এবং সুদূরবর্তী কল্পনার অনুবর্তী বলে প্রায়শই তা বাস্তব-সম্পর্ক শিথিল। কিন্তু রোমান্টিকতায় কল্পনার আতিশয্য আছে বটে, তবে তা প্রধানত জীবনকেন্দ্রিক এবং বস্তুনিষ্ঠ। এই বৈষম্য সত্ত্বেও রোমান্স এবং রোমান্টিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক অসম্ভব নয়। বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রাখে।

প্রকৃতি-নির্ভর জীবনের প্রচ্ছায়ায় মানব-হৃদয়ের শূন্যতা-পূর্ণতায় রোমান্স ও রোমান্টিকতার জন্ম বলে মানুষ তার দ্বারা প্রভাবান্বিত। সেজন্যই সে সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, জয়-পরাজয়ে, হৃদয়-অভ্যন্তরে আপন ভুবন গড়ে তোলে পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ বেদনার প্রকাশে। তাই হয়তো তার ভাব-চিন্তা কখনো প্রকৃতি, কখনো মানুষ কিংবা ধর্মকেন্দ্রিক অলৌকিক বিশ্বাসের উপর ভর করে প্রেমের শতদল মেলে ধরে। এ কথা ময়মনসিংহের গীতিকায় বিকশিত নারী চরিত্রের বেলায়ও একান্তভাবে প্রযোজ্য।

ময়মনসিংহের গীতিকায় নারী চরিত্রসমূহের মধ্যে যুবতীকন্যা, সখী, ভাবী, মা, মামী, শাশুড়ী, পড়শী নারী, রানী, দাসী, দূতী, পতিতা, কুটুনী, সতীন, নাপিতানী, বিমাতা, সন্তানহীনা, কাঠুরানী, জেলেনী, ধোপানী, চণ্ডালিনী, বোন, ননদিনী প্রভৃতির সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। এদের আচরণে বিশ্বাসে, ভাবনায়-কল্পনায় কখনো আদিম কৌমচেতনা, কখনো কৃষিনির্ভর লোকমানস, কখনো প্রতিপত্তিশীল সামন্ত মানস, কখনো দলমত নির্বিশেষে মানুষের একাত্মতা, কখনো বা পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি প্রসূত স্বাভাবিক প্রেমচেতনা কিংবা সামন্ত প্রভূদের জুলুম নির্যাতনে দৈবাশ্রয়ী অসহায় মানুষের মুক্তি কামনায় অথবা প্রেমবঞ্চিতের ধর্ম চিন্তায় পরিস্ফুট। যেহেতু নারী চরিত্র-সমূহের কেন্দ্রভূমি নায়িকা চরিত্র এবং তাকে ঘিরেই রোমান্স বা রোমান্টিকতার আবর্ত সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেহেতু আমরা সে আলোকেই রোমান্স-রোমান্টিকতার বিশ্লেষণের প্রয়াস পেতে পারি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মানুষের জীবন-আচরণ পরিবেশ প্রসূত বলে ময়মনসিংহের গীতিকায় প্রতিফলিত নারী চরিত্রসমূহ উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক

বৈশিষ্ট্যালোকে কিছুটা স্বাভাবিক মানসবৃত্তি লাভ করেছে। বোধকরি সেজন্যই এখানকার মানুষের মন আকাশ-বাতাস-জল-বন-জঙ্গল-নদ-নদী-খাল-বিল-পুকুর-হাওরের স্নিগ্ধ শোভায় বিকশিত এবং স্বাভাবিক গতিপ্রাপ্ত হয় বলেই হয়তো নায়িকা চরিত্রের প্রায় সবাই ঋতু চক্রাবর্তে কখনো কোমল-উছল প্রেমিকা, কখনো মমতাময়ী স্বাপ্নিক বিরহিণী, আবার কখনো বা দু:সাহসী-বুদ্ধিমতী-সতী এবং প্রতিবাদী নায়িকা।

ময়মনসিংহের-গীতিকায় চিত্রিত নায়িকাদের ভাবনা কল্পনায় এক সুগভীর রোমান্টিক প্রেমের স্ফূর্তি জাগরিত হয়। এর মূল উৎস অনুসন্ধানে পূর্ববঙ্গের ভূ-প্রকৃতি ও ঋতুবৈচিত্রের কথাই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। প্রতিটি নায়িকা চরিত্রই যেন এখানকার আকাশ-বাতাস-জল-স্থল-ঘিরে সুষমামণ্ডিত সব কিছুর সঙ্গে সুবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। বোধ করি তাই তাদের প্রেম শতধারায় বিচ্ছুরিত হয়ে নদীর জোয়ার-চাঁদ-তারা-সূর্য-মেঘ-কিংবা কদম-কেয়া-মহুয়া-চম্পা-পাখি ইত্যাদির সঙ্গে উপমিত হয়ে কল্পনার সুখ-স্বর্গ গড়ে তোলে :

১. ফুল যদি হইতারে বন্ধু ফুল হইতে তুমি।
কেশেতে ছাপাই রাখতাম ঝাইড়িয়া বানতাম বেণী ।।
[মহুয়া, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ১৫]

২. চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগা সারা নিশি।
চান্দমুখ দেখিতাম নিরালায় বসি ।।
[কমলা, দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ১৭০]

এ ধরনের রূপকল্প মধ্যযুগের অন্যান্য শাখার সাহিত্যে, বিশেষ করে আরাকান রাজসভার রোমান্টিক প্রণয়-উপাখ্যানগুলোতে, পুঁথি সাহিত্যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী সাহিত্যেও লক্ষণীয় :

অতশী কুসুম হইত শ্যাম
আমার কালকেশে লোটনে বাঁধিয়া রাখিতাম।
[চারুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৭৮]

এখানে উল্লেখ্য, এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও ময়মনসিংহের গীতিকা বস্তুপ্রধান, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা বস্তুকে ছাপিয়ে আধ্যাত্মিকতায় আশ্রিত। অর্থাৎ ময়মনসিংহের গীতিকা একান্তই বস্তু-প্রকৃতি নির্ভর; কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় প্রকৃতি উপলক্ষ মাত্র। তবে নায়িকা মনের ভাব-কল্পনায় নায়কের সৌন্দর্য পরিস্ফুটনের এমন দৃষ্টান্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *মৈমনসিংহ-গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়* পরিদৃষ্ট হয়।[১]

নায়িকার রূপ বর্ণনাতেও এমন রোমাঞ্চকর চিত্রকল্প[২] দৃষ্ট হয় যা আধুনিক রোমান্টিকতার মত আমাদের মন ও মানসকে পূর্ববঙ্গের প্রকৃতিনিষ্ঠ অনাবিল স্বপ্নে আপ্লুত করে :

১. আগল ডাগল আখিরে আসমানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখলে না যায় পাশুরা ।।
[মহুয়া, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ৫,৬]

২. অঙ্গের লাবণী সুনাইরগো বাইয়া পড়ে ভূমে।
[সোনাই বিবি, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ১৭৬]

৩. চলনে খঞ্জন নাচে বলনে কুকিলা।
[চন্দ্রাবতী, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ১১১]

এ-ধরনের বহি:সাদৃশ্যগত রূপবর্ণনা ড: দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *মৈনমনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* অনেক পালায় বিধৃত হয়েছে। সেখানেও মূলত ময়মনসিংহের গীতিকা ও মধ্যযুগীয় অন্যান্য কাব্যের কবিতায় বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অন্তর্গত কোন মিল নেই।[৩] তাছাড়া, গীতিকার অন্তরালে যেন বাংলাদেশ নামের এক ঐশ্বর্যময়ী স্বপ্নের ভূখণ্ডকেই খুঁজে পাই,যার প্রচ্ছায়ায় সেই প্রেমময়ী কোমল রূপবতী পল্লীবালাদের সময়োচিত প্রেমের পটভূমিও গড়ে উঠতে দেখি :

১. ধীরে ধীরে চল্যা কন্যা নদীর ঘাটে আসি।
আইস্যা দেখে নদ্যার ঠাকুর বাজায় প্রেমের বাঁশী।।
[মহুয়া, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ১৫]

২. এই দেখা পরথম দেখা জলের ঘাটে অইল।
উভেতে উভেরে দেখ্যা পাগল অইয়া গেল।।
[ভেলুয়া, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৪২ : ১৪৭]

উল্লেখ্য, প্রকৃতিনিষ্ঠ প্রেমের এমন পটভূমি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীতে যমুনা তীরে, কদমের তলে কিংবা 'কালিনী নইকূলে' নির্দিষ্ট হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনায় পূর্ববঙ্গের সেই নির্জন জলের ঘাট, নদীর ঘাট, ফুলবাগান কিংবা গভীর বনের বর্ণনা আমরা আরো অনেক গীতিকায় লক্ষ্য করে থাকি।[৪] তবে গীতিকায় বিধৃত বনবাসজনিত রোমান্টিক পটভূমির পরিকল্পনা যেন অনেকাংশে *রামায়ণ-মহাভারত* প্রভাবপ্রসূত :

অশোক বনেতে সীতা রৈল একেশ্বরী।
তাহানে বহুল তর্জ্জে যথা নিশাচরী ।।
[মণীন্দ্রকুমার ঘোষ : ১৫২]

সেখানে 'নলদময়ন্তীর উপাখ্যান' কিংবা 'শকুন্তলার উপাখ্যানও' যেন বনের পটভূমিকায় স্বপ্নের উচ্চমার্গে উঠেছে। ঠিক অনুরূপ চিত্র কৃত্তিবাসী *রামায়ণের* 'অরণ্য কাণ্ডে'ও বর্ণিত হয়েছে। এসবের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গাথার কিছু অংশ তুলনীয় :

মৃগ ময়ুর আর গো বনের পশুপাখী।
সীতার সঙ্গের সঙ্গী গো তারা সীতার দু:খে দু:খী।।
শুকসারী ছিল দুই গো পঞ্চবটী বন।
বনে হইল প্রতিবেশী গো তার দুইজন ।।
[চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ২৫৬]

এখানে উল্লেখ্য, গীতিকায় চিত্রিত বন এবং *রামায়ণ-মহাভারতে* কল্পিতবনেও যেন অন্তর্গত গরমিল লক্ষ্য করা যায়। তবে 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' গীতিকাটি বোধ হয় পরিপূর্ণভাবে *রামায়ণের* সীতা-রাম-লক্ষ্মণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং পরবর্তীকালে মাইকেল মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্যে* তার প্রতিফলন লক্ষনীয়। দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, 'মাইকেল মধুসূদনকৃত *মেঘনাদবধ কাব্যের* সীতা সরমার কথোপকথনের অংশটি সম্ভবত কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন [দীনেশচন্দ্র সেন ১৯১৯ : ১৩৮]। এ সুত্রেই বলা যায়, বনের পটভূমিজনিত রোমান্টিক চিত্রকলাগুলো যেন ঐতিহ্যগতভাবে 'সন্নমালা', 'কাজলরেখা', 'রূপবতী', 'কাঞ্চনমালা' ইত্যাদি গীতিকায়ও বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া, বনবাস দেবার অনুরূপ স্বাপ্নিক পরিকল্পনা কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যেও দৃষ্ট হয় এবং সেখানেও প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের শাশ্বত মিল দৃশ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও গীতিকায় বিধৃত প্রেমের নির্জন স্থানগুলোকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের বন-পুকুর-হাওর-নদীঘাটের অনাবিল স্বাধীন প্রেমের পটভূমি বলে মনে হয়, যা অধিকাংশ গাথায় কলাগাছ, মান্দার গাছের বেড়া, ঝাড় জঙ্গল বিশিষ্ট পুকুর পাড়ে ফুটন্ত ফুল সজ্জিত কদম তলায় এবং বনে জঙ্গলে রচিত হয়েছে। এজন্যই বোধকরি এ সব নায়ক-নায়িকা আধ্যাত্মিক আবরণমুক্ত হয়ে বস্তুনিষ্ঠ জীবন-নির্ভর প্রেমে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে অসহায় হয়ে তারা সেই প্রকৃতির বাস্তব অঙ্গনেই আপন হৃদয়ের বিরহ-বেদনার সুরের প্রতিধ্বনি শোনে এবং আত্মীয়তার গভীর সুত্র খুঁজে পেয়ে অপরিসীম রোমান্টিক হয়ে ওঠে :

কও কও কও পঙ্খী আরে কও তরুলতা।
ঢেউয়ের কুলে পইরা বন্ধু এখন গেল কোথা।
[দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ৩১]

এ কারণেই হিংস্র জীব-জানোয়াররা পর্যন্ত মহুয়ার সমব্যথী হয় এবং 'অভাগ্যা মহুয়ায়' দেখে বড় বড় বাঘ ভালুক দূরে সরে যায়। এমনকি গীতিকায় বর্ণিত নায়িকাবৃন্দের সেই অন্তক্ষরণ যেন পূর্ববঙ্গের নদীর স্রোতের টানে দিশেহারা 'শোতের শেওলা' কিংবা কূল ভেঙ্গে নদীর মধ্যে চড়া পড়ার মতই ব্যঞ্জিত হয়। জীবন প্রকৃতি-নির্ভর এই বিরহ ময়মনসিংহের গীতিকায় বিস্তর লক্ষ্য করা যায়।[৫] সঙ্গে সঙ্গে এ কল্পনা প্রবণতায় নায়িকাদের সুখ দু:খের সাক্ষীও বাংলার নিসর্গ থেকেই মেলে :

চন্দ্র সূর্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী।।
[মহুয়া, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ১৬]

এভাবে 'গীতিকার প্রেমের লীলাকে সুষম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করবার জন্য দৈনন্দিন সামান্যতা থেকে একটা কল্পনার রম্য স্তরে উন্নীত করবার জন্য একদিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশকে, অপরদিকে বর্ণনা করা হয়েছে নানাবিধ রোমান্টিক কলাবিলাসের [ক্ষেত্রগুপ্ত ১৩৬৩ : ১৪৩]। মনে হয় এসব কলাবিলাসের মূলে রয়েছে আদিম সমাজের সর্বপ্রাণবাদের সর্বাত্মক প্রভাব। কারণ, 'পশু-পাখী, গাছপালা, পাথর, মাটি, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই আত্মা বিদ্যমান, এই বিশ্বাস রয়েছে সর্বপ্রাণবাদের মূলে [মুহম্মদ আবদুল খালেক ১৯৮৫ : ২৮৮]। তাই বোধ হয় এগুলোকে সাক্ষী রেখে বিরহ-বর্ণনার এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক গীতিকায় পরিলক্ষিত হয়।[৬] আর 'বাঙলার কাব্যের যে দুইটি প্রধান ধারা, মননরীতি ও প্রকাশভঙ্গীর যে দুইটি প্রধান রূপ, বাংলার নিসর্গ গঠনের বৈচিত্র্যের মধ্যে তার খানিকটা পরিচয় মেলে [হুমায়ুন কবির ১৯৭০ : ৯]। তাই দীনেশচন্দ্র সেনও বলেন: 'এই পল্লী গাথাগুলিতে যে দেশ দেখতে পাই, তাহাই খাটি বঙ্গদেশ [দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৩৯ : ২১]।

রোমান্সের একটি স্বতন্ত্র ধারা অসহায় নায়িকামনের ভাবকল্পনায়, প্রিয়জনের মঙ্গল অমঙ্গল আশঙ্কায়, লৌকিক বিশ্বাসে, ভক্তি শ্রদ্ধায়, সতীত্ব রক্ষায়, পূজা-অর্চনায় কিংবা নিয়তি নিষ্ঠায় চিরাচরিত আচরণাদি ও সংস্কারে রূপান্তরিত হয়। গীতিকায় এসব সংস্কারের মধ্যে সাধারণত শুভাশুভ চিহ্ন, ধর্মকেন্দ্রিক অন্ধবিশ্বাস, সতীত্বের পারাকাষ্ঠা, জ্যোতিষ গণনা, নামকরণ, বশীকরণ, ঝাড়ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র, যাদুবিদ্যা,

তাবিজ কবজ, দিব্যদান, আত্মার রূপান্তর, অতিপ্রাকৃতজীব, দৈবনির্ভরতা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় :

(ক) মঙ্গল অমঙ্গল আশঙ্কা

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা।
বাদ্যার ছেরি মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা।
[মহুয়া, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ৩৬]

(খ) অলৌকিক বিশ্বাস :

যাইতে জলের ঘাটে নাহি চলে পাও।
শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও॥
জলের ঘাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ।
হাঁচি টিকটিকি আর যত অলক্ষণ॥
[দেওয়ান ভাবনা, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ২৭]

এছাড়া খনার বচন, ডাকের বচন, প্রবাদ, সত্যপীরের পুথি, *রামায়ণ*, *মহাভারত*, মঙ্গলকাব্য, রোমান্টিক কাব্য উপাখ্যান, পুথিসাহিত্য, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এমনকি পদাবলী সাহিত্যেও এসবের সাদৃশ্য বর্তমান।[৭]

তবে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এখানে এ ধারণাই জন্মে যে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* লোক সাহিত্যের অনেক কাছাকাছি এবং এ লোকজ ধারা ক্রমান্বয়ে পদাবলী সাহিত্যে উন্নীত। সংস্কৃত সাহিত্যও লোকসাহিত্য থেকে অনেক সামগ্রী গ্রহণ করেছে। ফলে সামাজিক পটভূমিকায় গীতিকা ও মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যেও বহির্গত সাদৃশ্য বিদ্যমান। যেমন :

পতি জিয়াইয়া সতী ফির্য্যা আইল ঘরে।
জয় ধ্বনি হইল জুড়িয়া নগরে।
কেউ বলে 'বেহুলা জিয়াইল লক্ষীন্দরে।
কেউ বলে 'সতী কন্যা গেছিল দেবপুরে।।
[মলুয়া, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ৯৬]

এর সঙ্গে বিজয় গুপ্তের *পদ্মাপুরাণের* কিছু অংশ তুলনীয় :

শুনিয়া সকল লোকে হয়ে চমৎকার।
পুরনারী সবে দিল জয়ে জোকার।।

ধন্য ধন্য বেউলারে সর্বলোকে বলে।
সাহে সদাগরে নাচে বেউলা লয়ে কোলে।।
[জয়ন্তকুমার দাশ গুপ্ত ১৯৬২ : ৫২১]

সতীত্ব রক্ষা ও পরীক্ষার এমন সংস্কার *রামায়ণ মহাভারতেও* লক্ষণীয়। তবে এসব কাব্যের সঙ্গে গীতিকার মূলগত পার্থক্য এই যে, গীতিকায় সতীত্ব রক্ষার বিষয়টি স্বত:স্ফুর্ত হৃদয়বৃত্তি থেকে প্রস্ফুটিত ও বস্তুনিষ্ট, কিন্তু সমসাময়িক অন্যান্য কাব্যে তা বহিরারোপিত ও বস্তুনিরপেক্ষ জগতে পরিব্যাপ্ত। অনুরূপ-সংস্কার প্রবণতা কোনো কোনো গাথায় প্রেম-ভক্তি-শ্রদ্ধা ইত্যাদি মিশ্রিত হয়ে ধর্মবোধ ও পূজায় পরিণত হয়েছে :

ভালা ঘরে দিছলা বিয়া ভালা বরের কাছে।
কেমনে খণ্ডাইবা দু:খ কপালে যা আছে।।
শ্বশুর বাড়ীতে থাকতাম আমি করিয়াছি মন।
সেইত আমার গয়া-কাশী সেইত বৃন্দাবন।
[দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ৮৩]

নায়িকা চরিত্র অবলম্বনে এমন মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বহি:প্রকাশে ধর্মাশ্রিত রোমান্সের মিশ্রিতস্বরূপ অধিকতর প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে *চন্দ্রাবতী'* গীতিকায়। এখানে প্রেমবঞ্চিতা নায়িকা যেন একান্তভাবে ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে :

নির্মাইয়া পাষাণ শিলা বানাইলা মন্দির।
শিব পূজা করে কন্যা মন করি স্থির।।
অবসর কালে কন্যা লেখে রামায়ণ।
যাহারে পড়িলে হয় পাপ বিমোচন
[দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ১১৪]

এখানে ঘনীভূত রোমান্স যেন বিরহের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ ধরনের ধর্মাশ্রিত রোমান্স আরো অনেক গীতিকায় মেলে।[৯] কিন্তু এর কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী সেন রাজগণের উপেক্ষা, বীতশ্রদ্ধা ও নিরুৎসাহের কথাই মনে পড়ে। কারণ, সেন রাজগণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত মানসিকতাই ছিল যে মানবের কীর্তি নিয়ে কাব্য রচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র, বিশেষ করে ঘৃণ্য কথিত ভাষায়। এজন্য তারা নরলীলার পরিবর্তে

কাল্পনিক দেবলীলার বর্ণনার প্রতি কবি ও লেখকগণকে সমধিক উৎসাহিত করেছিলেন [দীনেশচন্দ্র সেন : ৯৭৬]। কাজেই আমরা রোমান্টিকতার পরিবর্তে পেয়েছি রোমান্স। কিন্তু গীতিকা তার কিছুটা ব্যতিক্রম।

বিপদাপন্ন নায়িকাবৃন্দের বিপদ মুক্তির মানসে শুক-শারীর সহায়তা গ্রহণ এক অলৌকিক স্বপ্নচারিতা বলে মনে হয়। অবশ্য পাখির সাহায্যে বিশেষ করে কবুতরের সাহায্যে পত্রপ্রেরণের কথা আমরা শুনলেও গীতিকায় স্বপ্ন, পীর-সন্ন্যাসী, গুরু ঠাকুর-করম ঠাকুর, গণক, শ্রীঅঙ্গুটি, শুকপাখির ভবিষ্যৎবাণী বা দৈববাণী পরিবেশন কিংবা সে বাণী সম্পৃক্ত আশীর্বাদে-অভিশাপে, ভাগ্য বিপর্যয়ে-পরিবর্তনে অসহায় মানুষের মানসিক শূন্যতা পূরণের এক রোমান্সপ্রিয় প্রয়াস বলেই ধারণা জন্মে :

'কহ কহ ছিরি অঙ্গুট সত্য পরিচয়।
বনের মধ্যেই কি হইল সকল পরিচয়।।
তবেত ছিরি অঙ্গুইট সকল কহিল।
একে একে সকল কথা পরিচয় দিল ।।
[রাজা তিলক বসন্ত, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৪২ :]

নায়িকা চরিত্র কেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ রোমান্স আরো অনেক গীতিকায় মেলে।[১০] বিশেষ করে গণকের ভাগ্যগণনা, করম পুরুষের অভিশাপ, দৈববাণী শ্রবণে মানসিকতার পরিবর্তন, শুকপাখীর কথায় কন্যাকে বনবাস দান, সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা কিংবা 'সুন্দামেথীর দেশ' ইত্যাদি এক অলৌকিক রাজ্যের ভাবসম্পদ বলেই মনে হয়। আর অনুরূপ ভাবসম্পদ রূপকথা থেকে আহরিত বললে অত্যুক্তি হবে না এবং এগুলো লোকজ বিশ্বাসেরই অঙ্গ।

জীবনের ব্যর্থতা-শূন্যতা দুর্বলতার ফলস্বরূপ নায়িকা-মনে একরূপ রোমান্সের উদ্ভব হয় এবং তা ময়মনসিংহ গীতিকায় নিয়তিনিষ্ঠরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে :

'আপনা বইলা প্রাণ সপিলাম সেও করিলা দূরা
কারে বা কহিমু মন্দ কপাল হইল বুরা।।
[ভারইয়া রাজার কাহিনী, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮[ক] : ১৮০]

এ নিয়তিনিষ্ঠা মধ্যযুগের সব সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি আধুনিক সাহিত্যেও তার বিস্তৃতি দুর্লক্ষণীয় নয়। তবে এসব সংস্কারের গোড়ার কথা জানতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, 'কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মতই সংস্কার এবং বিশ্বাস মানুষের আদিম অবস্থা থেকেই তার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে চলে আসছে।...

মানুষের জ্ঞান বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ। সেই কারণে সম্মুখস্থ বহুবিধ সমস্যার সমাধান তার পক্ষে করা সম্ভব হয় না, ফলে কল্পনার আশ্রয় তাকে নিতেই হয়। বোধ করি কল্পনার এই আতিশয্যই মানুষকে নিয়তির দিকে আকর্ষণ করে, কালে তা থেকেই জন্ম নেয় বিচিত্র লোক বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি।[১১] তাছাড়া, অজ্ঞ ও অনগ্রসর মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠতে না পেরে আত্মপ্রত্যয়হীন হয়ে উঠে।

গীতিকাসমূহে রোমাঞ্চকর আবহ সৃষ্টির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বাঁশীর এবং এ বাঁশীর সুরে উতলা নায়িকা-মনের ভাব-কল্পনাও যেন ময়মনসিংহের নিসর্গ ছুঁয়ে এক সুদূর আহবান জানায় :

না জানি অন্ধের বাঁশী কিবান যাদু জানে।
ঘরে বান্ধ্যা বেড়ার মন বাইরে টাইন্যা আনে।।
[আন্ধাবন্ধু, দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯৫৮[ক]: ১৮৭]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে *আন্ধাবন্ধু* গীতিকার যবনিকাপাত যেন কবি জসীমউদ্দীনের *সোজন বাদিয়ার ঘাট* এর সঙ্গে তুলনীয় এবং এভাবেই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্যের একটি সুদৃঢ় মেল-বন্ধন ঘটেছে বলে মনে হয়।

গীতিকায় রোমান্সের পাশাপাশি রোমান্টিকতার অবস্থানও লক্ষণীয় :

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুব্যা মর।।
কোথা পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।।
[মহুয়া, দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ১২]

এখানে নায়িকা নদী, নদীরজল, কলস, দড়ির সমন্বয়ে নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার পল্লী জীবন কেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠ প্রেমের স্বপ্ন যেমন দেখেছে, তেমনি নায়ক তার হৃদয় উপচানো প্রেম-নিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হয়ে কল্পনায় প্রিয়াকে জলভরা গাঙ্গে রূপান্তরিত করে তাতে ডুবে মরার বাসনায় পরিতৃপ্ত হতে চেয়েছে। আর এখানেই বস্তুনিষ্ঠ রোমান্টিকতা ও বস্তুনিরপেক্ষ রোমাঞ্চকর ভাবের এক অদ্ভুদ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ কবি বস্তুনিরপেক্ষ কল্পনার জগতের ভেলা ধীরে ধীরে সুখ-দু:খে ভরা পল্লীজীবনের ঘাটে ভিড়িয়েছেন। এতে রোমান্স ও রোমান্টিকতার অদ্ভুত মিশ্রণ সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্স থেকে রোমান্টিকতায় উত্তোরণ প্রক্রিয়া লক্ষণীয়।

গীতিকায় বিধৃত বারমাসীগুলোতেও যেন নারীহৃদয়ের বিরহ রোমান্স থেকে রোমান্টিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে ধারণা করা যায় এবং তা ঐতিহ্যগতভাবে আদিম শ্রমজীবী মানুষ কৃষকের লোকসঙ্গীত থেকে উৎসারিত হয়ে কালিদাসের *ঋতুসংহার*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, পুথিসাহিত্য এমনকি আধুনিক সাহিত্যেও সম্প্রসারিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, মযহারুল ইসলাম, দুসন জবাভিটেল, শিবপ্রসাদ ভট্টচার্য, আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ প্রসঙ্গে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই বারমাসীগুলো আমাদের গীতিকাগুলোতে প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হয় [আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৬৩ : ৩৭৬]। তবে এখানে একটি কথার উল্লেখ না করে পারা যায় না যে বারমাসী বোধকরি শ্রমজীবী মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ-নির্ভর জীবিকা পদ্ধতি প্রসূত। কারণ, আদিকাল থেকে মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে জীবিকা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে গমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। দূরযাত্রায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদজনিত এক ধরনের বিরহ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। বিশেষকরে স্ত্রীর মনে স্বামীর অভাবজনিত প্রেম ও স্বামীর আয়ের উপর সুখ স্বাচ্ছন্দের আশা-নিরাশায় এক সুগভীর অনুভূতি জাগ্রত হয়। বোধ করি বারমাসী গান নারীর সেই ব্যাকুলতারই অভিব্যক্তি। তাই অনেকের মনে হয় :

> বারমাসী একান্ত নারী জীবনাশ্রিত সঙ্গীত নারী জীবনের ... আশা, আকাঙ্খা, ভাবনা কল্পনাদিই এ গানের মূল সুর, মর্ম-বাণী। অন্যান্য লোকগীতির কিছু কিছু পুরুষের কর্মময় জীবনের গান, আবার কিছু কিছু নারী পুরুষের সম্মিলিত জীবনের কর্ম ও ধর্মসঙ্গীত। বারমাস্যা মূখ্যত: বা একান্তই নারী জীবনের ধ্যান-জ্ঞানের সুর-ভাবতী [শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য ১৩৬৬ : ৩৫]

অর্থাৎ এ গীতি স্থুলভাবে বার মাস বা ছয় ঋতুর পরিবর্তমান পটভূমিকায় মানব-মানবীর মানসরাজ্যের সুখ-দু:খের কথা হলেও তা প্রকৃতির প্রচ্ছায়ায় বাংলা সাহিত্যের আগাগোড়ায় নারী-প্রধান। একথা গীতিকার নারীচরিত্রের বেলায়ও গভীরভাবে প্রযোজ্য। তবে গীতিকায় যেভাবে বিবর্তনশীল প্রকৃতিনির্ভর বিরহ-কাতর নারী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা যেন প্রাচীন যুগ থেকে বিবর্তিত মধ্যযুগীয় নারী চরিত্রের স্বরূপ।[১৩] তাছাড়া রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, পুথিসাহিত্য, মঙ্গলবাক্য ও *ময়মনসিংহ-গীতিকায়* বারবাসী দৃষ্টে মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব হৃদয়ের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে যা বার মাস ও ছয় ঋতুর আবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয় এবং এ রূপান্তরে মানুষ ও প্রকৃতি যেন অভিন্ন সত্তায় সুখ-দু:খের অনুভূতিকে ভাগাভাগী করে নিয়েছে। আধুনিক কালেও এ বারমাসীর সুদূরবর্তী প্রভাব। লোক

গীতির বারমাসী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন শাখার সাহিত্যে বিধৃত বারমাসীর তুলনা করলেই বোধকরি বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়।

সখী চরিত্রসমূহ প্রায়ই নায়িকার আনন্দ বেদনায় সহমর্মী ও সম্পূরক রোমান্স-রোমান্টিকতার ব্যঞ্জনাবহ। এ যেন সামাজিক স্বীকৃতিজনিত রোমান্স-রোমান্টিকতার আর একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে :

রইল তথা পালং সই সুখ দুখের সাথী।
কান্দিয়া পোহায় কন্যা হায়রে দিনরাতি।।
অঞ্চল ভরিয়া কন্যা বনের ফুল আনে।
মনের গান গায় কন্যা বইসা বনে বনে।।
[দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮ : ৪১]

এ ছাড়াও অনেক গীতিকায় সখী-চরিত্র চিত্রিত হয়েছে এবং এ ধরণের সহানুভূতিশীল হৃদয় গরীব কাঠুরানী, জেলেনী প্রভৃতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ভাবরাজ্যে অপরিসীম আলোড়ন সৃষ্টি করে। উপরন্তু মনে হয়, সব নির্জিত মানুষেরই আত্মা এক এবং পৃথিবীর এক কটিতে তাদের বাস। এদিক থেকেও আদিকালের সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে এক ধরণের সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং আমরা এতক্ষণ ধরে যে কথাটি ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছি তার সংক্ষিপ্ত সার টানলে এরূপ দাঁড়ায় যে, *ময়মনসিংহ গীতিকায়* রোমান্সের অবস্থান, রোমান্স ও রোমান্টিকতার মিশ্রণ এবং তাঁর ধারাবাহিক বিকাশে গাথাকাব্যের অবদান কোন অংশেই কম নয়। সঙ্গে সঙ্গে নর-নারীর প্রেমে ঐহিক জীবনের পরিপার্শ্বজনিত প্রতিকূলতার সহস্র প্রতিঘাত, বিরহ মিলনের হৃদয়ার্তি সৃষ্টি করেছে রোমান্সের ঘনঘটা, তা থেকে উৎসারিত হয়েছে রোমান্টিকতার উন্মেষলগ্ন। এমনটি সম্ভবত গীতিকা ব্যতিরেকে মধ্যযুগের আর কোনো কাব্যধারায় পাওয়া সম্ভব নয়।

টীকা

১. নিম্নবর্ণিত গীতিকাসমূহের উদ্ধৃতিগুলো থেকেও ময়মনসিংহের গীতিকা ও বৈষ্ণব পদাবলীর কিংবা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* বহির্গত সাদৃশ্য এবং অন্তর্গত পার্থক্য লক্ষণীয়:

মৈমনসিংহ-গীতিকা (১ম খণ্ড) : মলুয়া (পৃ. ৫৪), চন্দ্রাবতী (পৃ. ১৮৬), দেওয়ান ভাবনা (পৃ. ১৭৮), কাজলরেখা (পৃ. ২২৩), *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, ২য় খণ্ড : ধোপার পাট (পৃ. ১৪), মদনকুমার ও মধুমালা (পৃ. ২৮৬), দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালী (পৃ. ৩৭২), সুরৎজামাল ও অধুয়া (পৃ. ৪১৩)।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা: চতুর্থ খণ্ড : রাজা রঘুর পালা (পৃ. ৭৯, ৮০) মুকুট রায় (পৃ. ১৩৪, ১৩৫) ভারইয়া রাজার কাহিনী (পৃ. ১৬৫, ১৭৩, ১৭৭), আন্ধা বন্ধু (পৃ. ১৯৩), বগুলার বারমাসী (পৃ. ২২৫), চন্দ্রাবতীর রামায়ণ (পৃ. ২৫২), সন্ন মালা, (পৃ. ২৭৫, ২৮০, ২৮৫), বীর নারায়ণের পালা (পৃ. ৩০৪), পীর বাতাসী (পৃ. ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৪৮), রাজা তিলক বসন্ত (পৃ. ৩৭৯), মলয়ার বারমাসী (পৃ. ৪০৬, ৪০৮), জীরালনী (পৃ. ৪৩০, ৪৪৫), চাঁদ রায় সোনারায়ের জন্ম (পৃ. ৪৭২)।

২.　এমন রূপকল্পের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* অথবা মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের রূপকল্প তুলনীয় :

১.　ঢল ঢল কাঁচা লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।
[চারুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৭১]

২.　পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
[মুহম্মদ আবদুল হাই : ১৩৭৫ : ৪০]

৩.　খঞ্জন জিনিয়া তোর নয়ন যুগল।।
চণ্ডীদাস

প্রসঙ্গক্রমে মধ্যযুগীয় মুসলিম রোমান্টিক কাব্যধারায় কবি আলাওলের *পদ্মাবতীর* রূপবর্ণনার চমৎকারিত্বেও আবিষ্ট না হয়ে পারা যায়না :

পদ্মাবতী রূপ কি কহিমু মহারাজ।
তুলনা দিবারে নাহি তিন লোক মাঝ।।
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।
মহা অন্ধকার মনো দৃষ্টি পরাভব।।
অলি কিপ ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠবে কেহ নহে সমসর।।
[আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৯৮২ : ৯১]

৩.　পদাবলী ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* সঙ্গে বহি:-সাদৃশ্যের দিক থেকে নিম্নলিকিত গীতিকা সমূহ তুলনীয় : ময়মনসিংহ গীতিকা (১ম খণ্ড) : মলুয়া (৫৩, ৬৯), চন্দ্রাবতী

(১১১), কমলা (১২৫, ১৪৮), সোনাই (১৭৩, ১৭৫, ১৭৬), রূপবতী (২৪৩, ২৫৪), কঙ্ক ও লীলা (পৃ: ২৭০-২৭৯), কাজলরেখা (৩২৭); *পূর্ব বঙ্গ গীতিকা* (২য় খণ্ড), ধোপার পাট (পৃ; ১৪), মৈষাল বন্ধু (৩৭, ৬৬), কাঞ্চন মালা (৯৪), ভেলুয়া (১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৬৬, ১৬৮, ১৮৮), মানিক তারা (২৫১, ২৫২, ২৫৩), মদনকুমার (২৮৬), দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালী (৩৫৩-৩৯৪), সুরৎজামাল ও অধুয়া (৪১২, ৪১৬), ফিরোজ খাঁ দেওয়ান (৪৪৩, ৪৫৪, ৪৭৫), *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৩য় খণ্ড: আয়নাবিবি (১৯৮), শ্যামরায়ের পালা (২৭), *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* চতুর্থ খণ্ড রাজা রঘুর পালা (৭৯, ৮০), মুকুট রায় (১৩৪, ১৩৫), ভারইয়া রাজার কাহিনী (১৬৫, ১৭৪, ১৭৭), আন্ধাবন্ধু (১৯৩), চন্দ্রাবতীর রামায়ণ (২৬৪), সন্নমালা, (২৭৫, ২৮০, ২৮৫), বীর নারায়ণের পালা (৩০৪) পীর বাতাসী (৪৩-৩৪৬, ৩৪৮) রাজা তিলক বসন্ত (৩৭৯, ৪০১), মলুয়ার বারমাসী (৪০৬, ৪০৮), জীরালনী '৪৩০, ৪৪৫), চাঁদ রায় সোনারায়ের পালা (৪৭২)।

৪. পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি-নির্ভর প্রেমের পটভূমি দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত নিম্নলিখিত গীতিকা সমূহেও প্রাধান্য পেয়েছে : মৈমনসিংহ-গীতিকা (১ম খণ্ড), (পৃ. ১৫), মলুয়া (পৃ. ৫১)

৫. জীবন ও প্রকৃতি নির্ভর রোমান্টিকতা দীনেশচন্দ্র সেন *মৈমনসিংহ* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* নিম্নলিখিত গীতিকাসমূহেও দৃষ্ট হয় :

* মৈমনসিংহ-গীতিকা (১ম খণ্ড), রূপবর্তী (পৃ: ২৫৪), কাঞ্চন মালা (পৃ: ৯৫), কঙ্ক ও লীলা (পৃ: ২৯৩), কাজল রেখা (পৃ: ৩২৮)।

* পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড), (৩য় খণ্ড), (৪র্থ খণ্ড)

৬. চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে বিরহ বর্ণনা ড: দীনেশচন্দ্র সেনের *মৈমনসিংহ-গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* নিম্নলিখিত পালাসমূহেও পরিলক্ষিত হয়: *মৈমনসিংহ-গীতিকা* ১ম খণ্ড : চন্দ্রাবতী (পৃ. ১১১), কমলা (পৃ. ১৫৩), দেওয়ান ভাবনা (পৃ. ১৮৪-৮৫), রূপবতী (পৃ. ২৫১), কঙ্ক ও লীলা (পৃ. ২৮৯, ২৯০, ২৯৭), কাজলরেখা (পৃ. ৩২০-৩৩৭), দেওয়ান মদিনা (পৃ. ৩৫২), *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ২য় খণ্ড, ধোপার পাট (পৃ. ৬-২৭), মইষাল বন্ধু (পৃ. ৪০, ৭১), কাঞ্চনমালা (পৃ. ৯১), কমলা রানীর গান (পৃ: ২১৫),: ৪র্থ খণ্ড; মুকুটরায় (পৃ. ১৪৬), ভারইয়া রাজার কাহিনী (পৃ. ১৭৪, ১৮১), আন্ধাবন্ধু (পৃ. ২০১, ২০৩), বগুলার বার মাসী (পৃ. ২৯৪, ২২৪), চন্দ্রাবতীর রামায়ণ (পৃ. ২৪৩-২৫৭), সন্নমালা (পৃ. ২৮৩), বীর নারায়ণের পালা (পৃ. ৩১৬), সোনা বিবির পালা (পৃ. ৫৭২)।

৭. আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ।
পাছে ডাকদিল কালিনী মাএ।।
তার ফলে মোর পরাণ পতী।
মোক ছাড়া কান্নায়ি গেলা কাতী।।
[হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৮০ : ২৭]

৮. সতীত্ব রক্ষার দৃষ্টান্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *মৈমনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*র নিম্নলিখিত পালাসমূহেও লক্ষণীয় : কমলা (পৃ. ১৪৫), কাজলরেখা (পৃ. ৩৩৯), মইসাল বন্ধু (পৃ. ৫৭, ৭৫৮), কাঞ্চনমালা (পৃ. ১১১-১১৬), রাজা তিলক বসন্ত (পৃ. ৩৭৮, ৩৮১), মুকুট রায় (পৃ. ১৪৯, ১৫০), বগুলার বারমাসী (পৃ. ১১৬), মদনকুমার ও মধুমালা (পৃ. ২৯০, ২৯১), রতন ঠাকুরের পালা (পৃ. ৩৩৪, ৩৩৫), বীর নারায়ণের পালা (পৃ. ২৯৩)।

৯. দীনেশচন্দ্র সেন : *মৈমনসিংহ-গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*'র নিম্নলিখিত গীতিকাসমূহেও ধর্মাশ্রিত রোমান্টিকতার স্বরূপ বিদ্যমান: ভারইয়া রাজার কাহিনী (পৃ. ১৭৩), আন্ধাবন্ধু (পৃ. ১৯৫), বগুলার বারমাসী (পৃ. ২১৪), চন্দ্রাবতীর রামায়ণ (পৃ. ২৪৪), সন্নমালা (পৃ. ২৮৮), রাজা তিলক বসন্ত (পৃ. ৩৮৮, ৩৯১), কমলা (পৃ. ১৫৪)।

১০. মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখা, ধোপার পাট, কাঞ্চনমালা ইত্যাদি।

১১. লোকবিশ্বাস ও নিয়তিনিষ্ঠার উদাহরণ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত নিম্নলিখিত পালাগুলোয়ও দৃষ্ট হয় : মহুয়া (পৃ. ১১১), মলূয়া (পৃ. ৯৫), কমলা (পৃ. ১৪৫-৫৫), (রূপবতী (পৃ. ২৪৯-২৫৬), কঙ্ক ও লীলা (পৃ. ৩০৮), কাজল রেখা (পৃ. ৩২০, ৩৩৯), দেওয়ানা মদিনা (পৃ. ৩৭৯-৩৮১), ধোপার পাট (পৃ. ২৪), কাঞ্চনমালা (পৃ. ১৯-১১০), ভেলুয়া (পৃ. ১৮০), আয়নাবিবি (পৃ. ২১০), সোনাই বিবি (পৃ. ১২০), বগুলার বারমাসী (পৃ. ২১৮, ২২৪), চন্দ্রাবতীর রামায়ণ (পৃ. ২৫৬-৫৭), বীর নারায়ণের পালা (পৃ. ৩০৩, ৩০৬), রতন ঠাকুরের পালা (পৃ. ৩৩৪), পীর বাতাসী (পৃ. ৩৬২-৬৩), রাজাতিলক বসন্ত (পৃ. ৩৭৫-৩৯৪), মলয়ার বারমাসী (পৃ. ৪১৭), আন্ধাবন্ধু (পৃ. ১৯১), সন্নমালা (পৃ. ২৭৮)।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (সম্) ১৯৮২ *পদ্মাবতী*। চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৬৩	লোকসাহিত্য। ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ।
ক্ষেত্রগুপ্ত ১৩৬৬	*প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা* ও নবমূল্যায়ন। কলকাতা।
চারুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্) বি.	'*বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণবতা*. ঢা. *মহাজন কবিতা*। (কলকাতা-দেবসাহিত্য সংস্করণ)
জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত (সম্) ১৯৬২	*পদ্মপুরন*। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৫৮	*মৈমনসিংহ-গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।
১৯৪২	*পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।
১৯৫৮ক	*পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, চতুর্থ খণ্ড।
১৩৪১	*বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।
১৯৩৯	*বাংলার পুরনারী*। কলকাতা: ন্যাশনাল লিটারেচর কোং।
মনীন্দ্রকুমার ঘোষ (সম্) ঢা. বি.	*মহাভারত* (কবি সঞ্জয় রচিত)। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।
মুহম্মদ আবদুল খালেক ১৯৮৫	*মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে লোক উপাদান*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আযেদ শরীফ (সম্) ১৩৭৫ — *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা*। ঢাকা।

শিব প্রসাদ ভট্টচার্য ১৩৬৬ — *ভারতীয় সাহিত্য বারমাস্যা*। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজন্সি।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্) ১৯৮০ — *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা।

হুমায়ুন কবীর ১৯৭০ — *বাঙলার কাব্য*। ঢাকা : খান ব্রাদার্স।